চৌত্রিশ বছর

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

ভূমিকা

১৩ জুন ১৯৫০, জীবনানন্দ দাশ সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লিখছেন:

প্রিয়বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন।

বেশি ঠেকে পড়েছি, সে জন্যে বিরক্ত করতে হ'ল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচ শো টাকার দরকার; দয়া ক'রে ব্যবস্থা করুন।

এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়-ছদ্ম নামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন, দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার ''জীবনস্মৃতি'' আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে পূর্বাশায় মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এখুনি চাই; আমাদের মত দুচার জন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এরকম দাবি গ্রাহ্য করবার মত বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন— সে জন্যে গভীর ধন্যবাদ।

লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দেব, না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ-সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরী হতে পারে। কবিতাগুলোর সবই এক সময়ের লেখা নয়। কবিতা বেছেই পাঠিয়েছি তবু যদি কিছু অপছন্দ হয় আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কবিতা আপনার সুবিধামত পূর্বাশায় কিংবা অন্য কোনো ভালো পত্রিকায় (উপযুক্ত টাকা দিলে ও মর্যাদা রাখলে)- ছাপাতে পারেন। জরুরি। আজকালই প্রত্যাশা করছি।

প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

''জীবনস্মৃতি'' ইত্যাদি লিখে সব টাকা শোধ করার কথা চিঠিতে লিখলেও, শেষ অবধি জীবনানন্দ দাশ জীবনস্মৃতি লিখে উঠতে পারেননি। তাঁর ধাতে জীবনস্মৃতি লেখার মতো ''আদিখ্যেতা'' ছিল না। কেননা ''যা মানুষের প্রাণের ভেতর এত আদিখ্যেতা জাগায় সে সব জিনিস ভালো লাগে না'' তাঁর। বরং গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সারাজীবন ধরে অল্প অল্প করে আত্মজীবনী লিখে গেছেন।

কিন্তু অগস্ট ১৯৩২-এ লেখা ''চৌত্রিশ বছর'' উপন্যাসটি তাঁর সব লেখাকে ছাপিয়ে গেছে। এখানে স্বয়ং ''জীবনানন্দ'' উপস্থিত। এমন পংক্তি পড়ে শিহরিত হতে হয়:

'' —সে আমাকে পথে-পথে ঘুরিয়েছে শুধু, পৃথিবীর এই জীবনানন্দকে অবহেলা করতে শিখিয়েছে— আকাশের নীল মুখখানা ভালো লাগত না আমার— নর-নারীর উৎসব ভালো লাগত না— গান শুনলে, সফল প্রেমের গল্প পড়লে, জীবনে কারু কোথাও প্রেমের সফলতা দেখলে, আমার নির্যাতনের আর শেষ থাকত না যেন—শুধু ওই এক সুখ—দেহ—চুল—রূপ—তার ঠোঁটের চিন্তাশূন্য প্রেমশূন্য ভাষা—তার হাতের অক্ষরের নিখুঁত ভাঁজ আমার সমস্ত দিনরাত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল—

—কিন্তু, আজ তিনি কেউ নন—'

(চৌত্রিশ বছর, ১৯৩২)

এখানেই শেষ নয়, উপন্যাসের নায়ক শৈলর ''ক্যাম্পে'' নামক অশ্লীল কবিতা লেখার জন্য চাকরি যায়। বাস্তবে জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল, বুদ্ধদেব বসু তেমনটাই লিখেছিলেন যে ''ক্যাম্পে'' লেখার দায়ে জীবনানন্দের কলেজের চাকরি যায়। জীবনানন্দ সেই গুজবে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে উপন্যাসের নায়ককে তেমন করে কল্পনা করেন। প্রকৃত ঘটনা হল, সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম ও হিন্দুর সংঘাতে, জুনিয়র হিসেবে জীবনানন্দর চাকরি যায়। তবে লেখক ও তাঁর সৃষ্ট নায়ক দুজনেই ''ক্যাম্পে'' কবিতা লিখেছেন, এটাকে ম্যাজিক রিয়েলিজম ছাড়া অন্য কী বলা যায়! উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশটি:

'মহিমবাবু একটা হাই তুলতে-তুলতে বললেন—কাজেই—হাইটা শেষ ক'রে বললেন কাজেই, তা ছাড়া, তুমি এ-কলেজে কয়েক বছর কাজ করেছিলে, তোমার কথাটা বিবেচনা না করাও সংস্কারে বাধে—ঠিক করেছিলাম তোমাকে রাখব—

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শৈল বললে— ঠিক করেছিলেন?

—হ্যাঁ

—এখন?

—কিন্তু, তুমি একটা কবিতা লিখেছিলে?

—কবে?

—এই কিছু দিন আগে! কবিতাটার নাম—

—ওঃ, "ক্যাম্পে"; হ্যাঁ, লিখেছিলাম—

— আমরা জানতাম না যে, তুমি আবার লেখ-টেখ; আমাদের কাছে যা রিপোর্ট আসছিল— আমরা খবরের-কাগজ-ফাগজ, এ-সব কিছু পড়ি না কি-না—জুনিয়ার স্টাফের ব্রাঞ্চের কাছ থেকে সমস্ত খবর পাই—অনেকটা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের মতো— আমাদের কাছে, তোমার সম্বন্ধে, যা রিপোর্ট দিয়েছিল তারা, তাতে জানতে পারি যে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রপ্যাগ্যান্ডাও করো না, কবিতাও লেখ না —তুমি নিজেও গত-বছর আমাকে বলেছিলে যে, বছর দুই হল, কিছু লিখছ না— কেমন না?

—হ্যাঁ'

(চৌত্রিশ বছর, ১৯৩২)

আরও আছে। আমরা জানি জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রথম বই ''ঝরা পালক''-এ কোনও নামের উল্লেখ ছিল না। শুধু লেখা ছিল ''কল্যাণীয়াসু —''। পরবর্তীকালে গবেষণা সূত্রে আমরা জানতে পারি এই মহিলা কাকা অতুলানন্দ দাসের কন্যা শোভনা। ''আমরা বেশ আছি'' উপন্যাসে সত্যেন ও শেফালির আড়ালে যে জীবনানন্দ ও শোভনার প্রেমের সাগা রচিত হয়েছিল তা এখানে মান্যতা পেল। তাঁর প্রেমাস্পদকে নিয়ে বড়ো আঁতের কথা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ:

'রমা বইটা পড়তে-পড়তে বললে—কিন্তু, আমাদের উৎসর্গও তো করেন নি আপনি—। এ কাকে উৎসর্গ করেছেন আপনি? এ কেমন ধোঁয়াটে উৎসর্গ: কোনও নাম দেন নি তো—

—নাম দিলেই কি ভালো হত?

—আমরা জানতে পারতাম-

—এ-সব কৌতূহল কেন?

—কবির সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই

—কেন?

—কবিকে আমরা ভালোবাসি-

—কবিকে?

—কিংবা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে—

—না, কবিত্বকে শুধু নয়- তা হলে, এই কবিতাগুলো পড়লেই হয়ে যেত—কবির নিজের জীবনের সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই—

—উৎসর্গাস্পদার সম্বন্ধে নয়?

— সেও তো কবিরই জীবনের : কবিরই জিনিস।

—জিনিস?

—এ-মেয়েটি কে? এঁকে কেন উৎসর্গ করেছেন?

—আপনাকে করা উচিত ছিল?

—আমাকে তো তখন চিনতেন না।

—চিনলে আপনাকেই উৎসর্গ করতাম?

—হয়তো, করতেন-

—এখন যখন চিনি—

—আমাকেই করবেন-

রমা পড়তে-পড়তে বললে —কিন্তু, এই মেয়েটি কে?

—আমার কবিতার ভিতর যে-মেয়েটি রয়েছে

—সে-মেয়েটি (হয়তো) আপনার জীবনের স্তরে-স্তরে বদলাবেন। —আমি তাঁর কথা বলছি না।

—তবে?

—পাঁচ বছর আগে এ কাকে আপনি উৎসর্গ করেছিলেন? তিনি কোথায় থাকেন?

—হয়তো, কলকাতায়ই

—হয়তো?

—তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না

—এই এক বছরের ভিতর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না— কলকাতায় কত বার যাওয়া-আসা হয়— সে তার বাসায় থাকে—আমি আমার মেসে থাকি—এক-এক দিন ভাবি, তার বাসায় এক দিন উঠে পড়ি গিয়ে যদি— তার পর কী হয়, কে জানে?

—এ-রকম ভাবেন?

—মাঝে-মাঝে ভাবি

—কিন্তু, যাওয়া হয় না?

—না'

(চৌত্রিশ বছর, ১৯৩২)

''চৌত্রিশ বছর'' উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে যে লাইনটি দিয়ে, ''বাবা বললেন, কলকাতা যাও, একটা কিছু করো, বাবা।'', হুবহু একই রকম লাইন দেখি ১৯৩২-এর ডায়েরিতে। আমাদের রক্ত হিম হয়ে যায়, এ কোন খেলায় মেতে উঠেছেন জীবনানন্দ দাশ। এত সরাসরি যাপনের কানাগলি সাঁকো ও বাঁক, প্রায় ডায়েরি বলা যায়, একটি উপন্যাস তবে বহন করতে পারে! পারে যে, জীবনানন্দ দাশ তা বারবার করে দেখিয়েছেন। ১৯৩২-এ লেখা প্রায় সমস্ত উপন্যাসই এই স্নায়ুচাপের আখ্যান।

''চৌত্রিশ বছর'' উপন্যাসে প্লট বলতে কিছু নেই। অনর্গল শুধু কথোপকথন। শুধু কথা কথা আর কথা। শৈল স্ত্রী, মা ও বাবাকে দেশে রেখে চাকরির সন্ধানে স্টিমার ও ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসেছে। উঠেছে একটি বোর্ডিঙে। আমরা জানি বরিশাল থেকে সেসময় স্টিমার ও ট্রেনে চেপেই কলকাতা আসতে হত। এরপর শুধু বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে, তেমন পরিচিতও নয়, শৈলর কথা বলে যাওয়া। এক নতুন উপন্যাসের শৈলি দেখল বাঙালি পাঠক। আমার তো মনে হয়, ঠিক সময়ে উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হলে, বাংলা উপন্যাস এক অন্য খাতে বইত।

আসলে গদ্য লেখার শুরু থেকে জীবনানন্দ কেন্দ্রীয় চরিত্রের অথরিটি, জমজমাট গল্পের বুনন, তথাকথিত রাজনীতিক-সামাজিক-নৈতিক সচেতনা থেকে দূরে থেকেছেন। হয়তো বাখতিনের মতো জীবনানন্দও বিশ্বাস করতেন একটি চরিত্র নিছক ''character'' বা ''actions'' নয় বরং ''index of a person's devotions to an idea in the deepest recesses of his personality''। জীবনানন্দ দাশের সৃষ্ট চরিত্র যেমন হেম, নিশীথ, বিভা, কল্যাণী, সুতীর্থ, মাল্যবান সিদ্ধার্থ যতটা না ''actions''-এর তার চেয়ে অনেক বেশি ''idea''-র। জ্ঞান থেকে নির্জ্ঞান, নিশ্চিত থেকে অনিশ্চিত ও বাস্তব থেকে অতি বাস্তবের দিকে যেতে যেতে তারা তো ''subtle''! উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধে জীবনানন্দ বলেছিলেন, ''subtle points of view are more deserving''। নিগূঢ় এই যাত্রা জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের প্রাণ ভ্রমরা।

নীচে ''চৌত্রিশ বছর'' উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কিছু তথ্য। যদিও আমি জীবনানন্দ দাশের ''চারটি উপন্যাস'' সম্পাদনার কাজে সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলাম, এই লেখাটির জন্য ভূমেন্দ্র গুহ ও প্রতিক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

'এই উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপি, আগের উপন্যাসটার মতনই, তিনটি ছাত্রব্যবহার্য এক্সারসাইজ খাতায় বিধৃত। তিনটি খাতারই ব্র্যান্ড: কমপ্যানিয়ন, ম্যানুফ্যাকচারড বাই চ্যাটার্জি ব্রাদার্স / ১৪৪ আমহার্স স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর রুম ন. ৯/ ক্যালকাটা।

প্রথম খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে: ''আ নভেল -I / জীবনানন্দ দাশ / অগস্ট ১৯৩২'', পৃষ্ঠাটার উপরের দিকে লাল ভোঁতা পেনসিলে লেখা ৮২; দ্বিতীয় খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা: ''আ নভেল II/ জীবনানন্দ দাশ / অগস্ট ১৯৩২'', পৃষ্ঠাটার মাঝামাঝি একটু নীচের দিকে একই লাল পেনসিলের মোটা সিসে লেখা ৫৮+২৮ = ৮৬; এই হিসেবগুলি দেখলে মনে হতে পারে যে, জীবনানন্দ, বোধ হয়, কোনও-এক সময়ে তাঁর বাক্সবন্দী পাণ্ডুলিপির খাতাগুলির একটা শৃঙ্খলাবান তালিকা বানাবার চেষ্টা করেছিলেন এক সময়ে, হয়তো ক'রেও ফেলেছিলেন, কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খাতাগুলি নিয়ে এত টানা হ্যাঁচড়া হয়েছে যে, তাঁর সে-হিসেব-নিকেশ আর কোনও কাজে লাগে নি; যাঁরা তাঁর খাতাপত্র সামলেছেন সাতের দশকে, তাঁরা আর লাল পেনসিলে লেখা এই আঙ্কিক অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে দেখার সময় পান নি। প্রথম খাতাটার প্রথম পাতাটার ডান দিকের উপরের কোনার কাছে পাতাটার এক-চতুর্থাংশ ব্লেড দিয়ে সুচারু ভাবে কেটে ফেলা হয়েছে, ব্লেডের ধারালো নিপুণতা মলাটেও এসে পৌঁছে গেছে, কিন্তু খাড়া-ভাবে কেটে-যাওয়াটুকু পর্যন্তই, অতএব, মলাটটা বেঁচে গেছে; কী ছিল ওই কেটে বাদ দেওয়া অংশটুকুতে? উপন্যাসটার নাম, অথবা অন্য কোনও খবর, যা এতটাই গুরুতর ভাবে অসংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল সেই মুহূর্তে যে, কেটে সমূলে বিসর্জন দিতে হল? একই ভাবে, তিন-নম্বর খাতাটার, প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে: ''আ নভেল III / জীবনানন্দ দাশ / অগস্ট ১৯৩২'', কিন্তু এই খাতাটায় লাল পেনসিলে লেখা কোনও হিসেবপত্তর নেই। লেখক-নির্বাচিত কোনও নামও নেই উপন্যাসটার। এই উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপির তিনটি খাতাই ছ'ফর্মার, অর্থাৎ, প্রতিটি খাতারই পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৬। প্রথম খাতাটার শেষ পাঁচটা পৃষ্ঠা সাদা, দ্বিতীয় খাতাটির শেষ তিনটি পৃষ্ঠা সাদা, এবং তৃতীয় খাতাটার শেষ পৃষ্ঠার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঠেসে লেখা; শেষ লাইনটা শেষ হয়েছে একটা বৃত্তাবদ্ধ এক্স-চিহ্ন দিয়ে, অর্থাৎ গল্পটা এখানে শেষ হল না, আরও টেক্সট আছে, এবং তা এক্স-চিহ্নে চিহ্নিত। শেষ লাইনের শেষের এক্স-চিহ্নটার শূন্যতাটাকে ভরাট না করতে পারলে গল্পটা শেষ হবে না। কিন্তু, শৈল যে-গল্পের কথক-চরিত্র তা ধ'রে আছে, এমন কোনও পাণ্ডুলিপির খাতা নেই আপাতত আমাদের কাছে, এবং এই উপন্যাসটার গোটাটা জুড়েই এ-রকম এক্স-এক্স-এক্স'য়ের অত্যাচার সইতে হয়েছে আমাদের। আমরা আর তখনকার মতো অধ্যবসায় খরচ করতে গেলুম না উপন্যাসটা নিয়ে, পাণ্ডুলিপি এবং কপি— সব পাশে সরিয়ে রেখে দিলুম। চ'লে গেলুম আর-একটা উপন্যাসে। আমরা বেশ আছি উপন্যাসটায়।

আমরা জীবনানন্দ'র উপন্যাসদের পাণ্ডুলিপির খাতাগুলিকে যখন গুছিয়ে তুলছিলুম প্রাথমিক ভাবে, বেশির-ভাগ উপন্যাসের লেখক-নির্বাচিত নাম ছিল না ব'লে, নির্ভর করছিলুম লেখাগুলির রচনাকাল এবং গল্পটার চরিত্রদের নামের সামঞ্জস্যের উপরে, এবং তদনুসারে খাতাগুলির গায়ে তথাকথিত প্রধান চরিত্রটার নাম লিখে কোনও বিশেষ উপন্যাসের খাতাদের গুচ্ছবদ্ধ করছিলুম; এই পদ্ধতিটায় একটা স্বাভাবিক অসুবিধে থেকেই যায়: কোনও একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির খাতা ক'টির সব শেষের একটি খাতা যদি হারিয়ে যায়, অথবা পর-পর দু'টি খাতা, তা হলে, বুঝতেও না পারা যেতে পারে যে, উপন্যাসটা অসম্পূর্ণ রইল, বিশেষত যখন জীবনানন্দ'র গল্প-উপন্যাস সাধারণত গোলালো বৃত্তে শেষ হয়ে যায় না, ''খোলা'' থাকে। অবশ্য, এই বইতে সংগৃহীত উপন্যাস ক'টি সম্পূর্ণই, কেননা, প্রতি ক্ষেত্রেই লেখাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পাণ্ডুলিপির শেষ খাতাটার শেষ কয়েকটা পৃষ্ঠা সাদা প'ড়ে আছে। আমরা বেশ আছি উপন্যাসটা কপি করা যখন শেষ হয়ে গেল, আমরা শৈল'কে আবিষ্কার করলুম, তার গল্পটার শেষের দিকের ন'-ন'টা পৃষ্ঠা লেখা হয়ে আছে সেখানে, কাত ক'রে আড়াআড়ি, যাতে আমরা বেশ আছি থেকে এই পৃষ্ঠা ক'টা আলাদা ক'রে চেনা যায়, লেখাটার শুরুতে বৃত্তাবদ্ধ এক্স-চিহ্নটা পর্যন্ত রয়েছে। পাশে সরিয়ে রাখা কপি-করা উপন্যাসটাকে টেনে বার করলুম আবার, চৌত্রিশ বছর উপন্যাসটা এই ভাবে সম্পূর্ণ হল। সাহায্য তাঁর "স্টোরি থিমস" খাতাটা থেকেও পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে এ-রকম একটা পাঠ্যাংশ আছে: ''ইনটারভেনিং চ্যাপ্টারস (শৈলকুমার).... (চ্যাপ্টার বিফোর লাস্ট)''। [প্রসঙ্গত, শৈল'র এবং কল্যাণী'র সাক্ষ্যে, মনে হয়, জীবনানন্দ তাঁর ''স্টোরি থিমস'' খাতাটার লেখা শুরু করেছিলেন এবং চালিয়ে গিয়েছিলেন খ্রি. ১৯৩২ জুন-জুলাই-অগস্ট।]

উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপিটায় কাটাকুটি বিশেষ নেই, কপি করতে গিয়ে অসুবিধেটা যে পোয়াতে হয়েছে, তা ওই এক্স-বাহুল্য নিয়ে; লেখক অন্তত দু'বার, অল্পস্বল্প সংশোধন করেছিলেন পাণ্ডুলিপিটার, এক বার কাঠ-পেনসিলে, একবার তুলনামূলক ভাবে গাঢ় কালিতে-কলমে।

জীবনানন্দ'র ছোট-ছোট অক্ষরের জড়ানো হাতের-লেখায় এই উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭২ + ৯ = ২৮১। ৭৩ বছর আগের লেখা তো, এখন অক্ষরগুলি সব লালচে এবং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সব খাতাতেই।

উপন্যাসটার নামটা আমাদের দেওয়া; নামটা ''শৈলকুমার'' দেওয়া যেত ''স্টোরি থিমস'' খাতাটার পরামর্শ মেনে নিয়ে, কিন্তু, উপন্যাসটার কথক-চরিত্রটা'র নাম যে শৈলকুমারই, তা উপন্যাসে বলা নেই, উপন্যাসে নামটা সব সময়েই শৈল। আমরা